সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৫৫তম বার্ষিকী

হ্যারি কে টমাস, জুনিয়র
বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত

‘‘ মানবজাতির সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদাবোধ এবং সবার জন্য সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি।”

আমরা প্রায়শই: ভুলে যাই যে স্বাধীনতা বলতে কি বোষায় তার একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা এবং এক্ষেত্রে সার্বজনীন বোঝাপড়ায় পৌছাতে এই বিশ্বের ঠিক কতটা সময় লেগেছিলো। অর্ধ শতাব্দী আগে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় খুব সহজ ভাষায় এর উল্লেখ রয়েছে।

‘‘ মানবাধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সকল মানব সন্তানই সমান ও মুক্ত। সকলেরই জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। জন্মগতভাবে সবাই যুক্তিবোধ ও বিবেক দ্বারা চালিত। সবারই অধিকার আছে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাচ্ছ্যন্দের সাথে একটি মানসম্মত জীবন যাপনের। ”

এই ঘোষণার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে মৌলিক মানবাধিকার কোন সাংস্কৃতিক বিষয় নয়, এটি সার্বজনীন। এটা কেবল একটি দেশের অভ্যন্তরে তাদের নিজস্ব ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সেখানকার নাগরিকদের বিষয় নয়, বরং এটি আমাদের সবার জন্য ভাববার বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রে আমরা এটা বুঝি যে মানবাধিকার ঘোষণার যথার্থ আদলে জীবন যাপন করা কতটা কঠিন কাজ। সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের অনেকেই তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা যদি এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ি তাহলে এর দুর্ভোগ আমাদেরকেই পোহাতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাগণ ‘ জীবন, স্বাধীনতা আর সুখের অন্বেষণের’ কথা লিখেছেন। পূর্বসুরীদের এই আদর্শ সবসময়ই আমাদের বিবেককে তাড়িত করে। সব সময় কথা দিয়ে আমাদের কার্যক্রমকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। আমাদের প্রতিদিনের জীবন আচরণও যে সব সময় আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে সেটাও হলফ করে বলা যাবে না। আজ থেকে একশ বছর আগে আমেরিকার নারীরা এমন একটি দেশে বড় হয়েছেন যেখানে তাদের ভোটের অধিকার ছিলো না । সার্বজনীন মানবাধিকারের মানদন্ডে যদি আজ থেকে ৫০ বছর আগের আমেরিকাকে বিচার করা হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ বলেই বিবেচিত হবে। তখন বর্ণবাদের ভিত্তিতে আমেরিকায় পৃথক পৃথক স্কুল চালু ছিলো।

কিন্তু গত ৪০ বছরে আমরা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বেলায় দ্রুত গতিতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছি। আমরা এমন লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি যে আমেরিকার সব নাগরিকই তাদের 'চরিত্রের দৃঢ়তার দ্বারা মুল্যায়িত হবেন, গায়ের চামড়ার রঙ দ্বারা নয়'। আমরা জানি যে আমাদের এই লক্ষ্য অর্জন করা খুবই কষ্টসাধ্য, তারপরও আমরা তা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সারা বিশ্বের অগনিত মানুষ আজ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। যারাই তাদের জীবনের এই অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রতিষ্টার সংগ্রামে লিপ্ত, আমেরিকা তাদেরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যারাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে আমরা অবশ্যই তাদের পাশে দাঁড়াবো। সেটা হতে পারে কিউবার গণতন্ত্রকামী জনগণ, ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক, জিম্বাবুয়ের বিরোধী নেতৃবৃন্দ, বেলারুশের সাংবাদিক সমাজ, উত্তর কোরিয়ার নিপীড়িত জনগণ যারা কখনোই মুক্তির স্বাদ পায় নি অথবা অন্য কোন জনগোষ্ঠী। সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করে মুক্তির আস্বাদ ছিনিয়ে আনতে আমরা সারা বিশ্বব্যাপি একটি আন্তর্জাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছি। যুদ্ধ সংক্রান্ত আইনকানুনের মারাত্মক লঙ্ঘন ও অন্যান্য নৃশংসতার ঘটনাকে বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। রুয়ান্ডা ও সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় গণহত্যাজনিত অপরাধ বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে নুরেমবার্গ ট্রায়াল কিংবা সিয়েরালিয়নে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্যাতন আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের অব্যাহত যুদ্ধ এটাই প্রমাণ করে যে জাতি হিসেবে আমরা সবার জন্য আশার আলো জাগাতে চাই।

প্রায় দুই বছর আগে আফগানিস্থান নিপীড়নমুলক শাসনের কবল থেকে মুক্ত হলেও, আমরা সেদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য আফগান জনগণকে সাহায্য করছি। দেশটির ভবিষ্যত স্থিতিশীলতার জন্য এই সাহায্য অত্যন্ত জরুরী। আমরা আশা করছি ইরাকের সাহসী জনগণও মুক্তির যে স্বপ্ন দেখছে খুব শীঘ্রই তারা তার সফল বাস্তবায়ন দেখতে পাবে। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, '' আমাদের লক্ষ্য একটি মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ ইরাক। আর দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তার সাথেই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করবো।"

যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে। কেবল রাজনৈতিকভাবেই নয়, সামরিক দিক থেকেও আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি। এটা এমন একটা পরীক্ষা যেখান থেকে আমরা সরে আসবো না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপি যুদ্ধের দুটো প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে আফগানিস্থান ও ইরাক। দেশ দুটিতে আমাদের কার্যক্রম পরস্পরের সাথে সংযুক্ত দুই অঞ্চলে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। মধ্য এশিয়ার

দেশগুলোর জন্য আফগানিস্থান একটি উদাহরণ হতে পারে। আর পুরো মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বে ইরাক একটি মডেল রাষ্ট্র হিসেবে ইরাক তার জায়গা করতে সক্ষম।

কেউই এ বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করবেন না যে আফগানিস্থান ও ইরাকের জনগণের মুক্তভাবে বাস করার ও স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। তাহলে কেন এই দুই রাষ্ট্র গণতন্ত্রের স্রোতধারার বাইরে থাকবে? আর কেনই বা তারা বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য দেশের মতো স্বনিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের অনেক বিষয়েই মিল রয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের অভিন্ন অঙ্গীকার দুই সমাজকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আমরা দুই দেশই বাক স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও ধর্মীয় সহনশীলতাকে সযত্নে লালন করে চলেছি। সেই সাথে নির্যাতন, অবিচার আর নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামেও আমরা অবিচল। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের সমান সুযোগ সৃষ্ঠিতে আমাদের দুদেশের সাফল্যে আমরা গর্ব করতে পারি। বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র এমন দুটো দেশ যেখানে সকল নাগরিক তাদের মত প্রকাশ, স্বাধীন ভাবে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস লালন এবং আলোকিত মুক্ত পরিবেশে জীবন যাপনের স্বাদ অনুভব করতে পারে।

কিন্তু আমাদের আরো অনেক কিছু করার রয়েছে। মাস্ত্মানদের হুমকি, দুর্নীতি ও মানব পাচারের মতো একটি ভয়ানক সামাজিক ব্যাধি মুক্ত পরিবেশে দুর করে আমরা আমাদের নাগরিকদের স্বপ্ন বাস্ত্মবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম জাগরণের যে আহবান জানিয়েছেন এবং সাম্যের যে জয়গান গেয়েছেন তাতে আমাদের অবশ্যই সাড়া দেয়া উচিত।

প্রেসিডেন্ট বুশ কিছুদিন আগে তাঁর একটি ভাষণে উল্লেখ করেছেন ''গণতন্ত্রের চর্চাই যে একটি জাতিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত করে তোলে তার প্রমাণ দিয়েছে বাংলাদেশ থেকে বতসোয়ানা আর মঙ্গোলিয়ার জনগণ। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতি এভাবেই গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করতে পারে। সারা বিশ্বের অর্ধেক মুসলিম জনগোষ্ঠি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থার আওতায় স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসের কারণেই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাফল্য পেয়েছে। যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিক জবাবদিহিতাকে মর্যাদা দেয় এবং ইশ্বরের সাথে আত্মিক যোগাযোগকে উৎসাহিত করে সেই ধর্ম অবশ্যই স্বশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার ও দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সবার কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ মানুষ যে ধর্মে বিশ্বাস করে অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।"

বাংলাদেশও তাদের সামনে যে পরীক্ষা রয়েছে তাতে ভালোভাবেই সাড়া দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক কম্যুউনিটিতে বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপর্ণ অবদান রেখে চলেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সৈন্য প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। সর্ব সম্প্রতি কঙ্গো এবং লিবিয়াতে বাংলাদেশের সেনা সদস্যরা সেখানকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশংসা আর সন্মান কুড়িয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েল তাঁর ঢাকা সফরের সময় বলেছিলেন, '' শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্জনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সাহায্য করেছে। আমরা মানব পাচার রোধে বাংলাদেশের উদ্যোগের প্রশংসা করেছি। স্থিতিশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই অঞ্চল এখনো নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এর পরেও পথ চলা এখনো অনেক বাকি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণী বিষয়গুলোতে যতটা মতপার্থক্যই থাকুক না কেন, এই দেশটির অগ্রযাত্রাকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে তাদের রাজনীতিবিদদেরকে একসাথে কাজ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে।"

বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব আমেরিকান নাগরিক খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা গণতন্ত্র, মুক্ত অর্থনীতি ও ধর্মীয় সহনশীলতা চর্চার বেলায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ হওয়া উচিত একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও স্বায়ত্বশাসিত নির্বাচন কমিশন গঠন করা। তাছাড়া নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার অবসান ঘটাতে হবে এবং সব কর্মীর সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ অবশ্য এর আগেই এসব বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমরা বাংলাদেশকে আরো বেশী মাত্রায় সাহায্য দিতে এবং নিবিড়ভাবে দেশটির সাথে একযোগে কাজ করতে ভীষণ আগ্রহী। বাংলাদেশের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো মোকাবেলায় আমরা সাহায্য করতে চাই। বাংলাদেশের ঐতিহ্যমন্ডিত সাংস্কৃতিক অর্জনের কথা বিবেচনায় এনে আমাদের দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিকে যতদুর সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমরা বাংলাদেশের সাথে সর্ম্পক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আজ আমরা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৫৫তম বার্ষিকী উদযাপন করছি। ছোট ছোট সব মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে আমাদের ভাই-বোনদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার জন্য একসাথে কাজ করতে অঙ্গীকার পূর্ণব্যক্ত করার আজই শ্রেষ্ঠ দিন। আর এটাই হচ্ছে মানবতার মূল চালিকা শক্তি যা আমাদেরকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

==========

জিআর/ ডিসেম্বর ৭, ২০০৩ (১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে প্রকাশের জন্য)

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: 8813440-4, d¨v·: 9881677; B-‡gBj: dhaka@pd.state.gov Ges Website: http://www.usembassy-dhaka.org) †hvMv‡hvM Ki"b|